।।ও৩ম্।।

শিখা-সূত্র

ঃ লেখক ঃ

পণ্ডিত জগদীশ বিদ্যার্থী (এম.এ.)

bikram arya
মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

।। ওঁ৩ম্ ।।

শিখা-সূত্র

ঃ লেখক ঃ

পণ্ডিত জগদীশ বিদ্যার্থী (এম.এ.)

ঃ সম্পাদক ঃ

উদয় বিদ্যালংকার

দ্বিতীয় সংস্করণ–১০০০ (২০১৭ সন্) মূল্য–১০.০০ টাকা

প্রকাশক ঃ
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ০৩৩-২২৪১-৪৫৮৩

সম্পাদক ঃ
উদয় বিদ্যালংকার

ব্যবস্থাপক ঃ
মহাত্মা প্রেম ভিক্ষু বানপ্রস্থী

অক্ষর বিন্যাস ঃ
ববলু দূবে
মো ঃ ৯১৬৩০৭০২০৯

।। উৎসর্গ ।।

এই বইটি শ্রী জন্মেঞ্জয় প্রধান স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর শ্রী যতীন্দ্র নাথ প্রধান এবং স্বর্গীয়া শ্রীমতী তিলোত্তমা প্রধানের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

উৎস্রগকর্তা শ্রী জন্মেঞ্জয় প্রধানের জন্ম বাংলা ৪ঠা ভাদ্র ১৩৩৯বঙ্গাব্দে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ওনন্দকুমার থানান্তর্গত কোলসর গ্রামে। মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ায় তাঁর লালন-পালন অত্যন্ত যত্নসহকারে হয়। প্রথমে শিক্ষা পরে দীক্ষা গ্রহণ করার পর বৈদিক বিচারধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঋষি দয়ানন্দের বাণীওআর্য গ্রন্থের প্রচার প্রসারার্থে নিয়ত থাকেন। শ্রী জন্মেঞ্জয় বাবু পূর্ব মেদিনীপুর জেলান্তর্গত নন্দকুমার ব্লকের অধীনে ব্যবত্তার হাটপশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নাড়াদাঁড়ী লক্ষ্মী নারায়ণ পার্ট বেসিক স্কুলে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করার পর ১৮-১—১৯৯৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

শিখাসূত্র বইটি বঙ্গীয় আর্য জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কেননা তার মধ্যে শিখাও উপবীত(পৈতা) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রস্তুত করা হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতা কেবল মানবের কল্যাণের জন্যে। তাই বইটির প্রয়োজনীয়তাকে লক্ষ্য রেখে মহাত্মা প্রেমভিক্ষু বানপ্রস্থী মহাশয়ের প্রোৎসাহনও ব্যবস্থাপনায় শ্রী জন্মেঞ্জয় বাবু বই প্রকাশনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন।বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভার দায়িত্বে শ্রী সমীরণ বাক্চীর আন্তরিক সহায়তা একইসাথে সভা প্রচারক আচার্য যোগেশ জীর সহমর্মীতার জন্যই প্রকাশিত করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাংবাংলার আর্য জগতে আর্য বিচারধারার প্রচার অধিক হোক এই আশায় বঙ্গীয় প্রতিনিধি সভার অধীনে বইটি প্রকাশিত করা হচ্ছে।

— সম্পাদক

ভূমিকা

"সা সংস্কৃতি প্রথমা বিশ্ব বারা"। বৈদিক সংস্কৃতিই বিশ্ব সংস্কৃতি। ইহা প্রথম এবং মহান সংস্কৃতি। উহাই সংস্কৃতি, যাহা মনুষ্যের আত্মার সংস্কার করিয়া তাকে সুসংস্কৃত করে।

"শিখা" বৈদিক সংস্কৃতিরই পতাকা। যাহা বিশ্বাস করে যে, বৈদিক সংস্কৃতি ঊর্দ্ধগামী, উন্নতির দিকে লইয়া যায়। বৈদিক সংস্কৃতি মানব সংস্কৃতি। ইতর ৮,৩৯,৯৯৯ (আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয় শত নিরানব্বই) যোনিচক্র অতিক্রম করিয়া জীব উন্নত হইয়া মনুষ্য জীবে পরিণত হইতে পারিয়াছে। তাহাকে আরও উন্নত হইতে হইবে। শিখা ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে থাকিয়া নির্দেশ করিতেছে যে, মনুষ্যের চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম প্রাপ্তি; ইহাই উন্নতির সর্বোচ্চ শীর্ষ। সেই শীর্ষ পর্যন্ত, মস্তক পর্যন্ত পৌঁছাবার আদর্শ এই শিখা দ্বারা সূচিত হয়।

"সূত্র" অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বৈদিক সংস্কৃতির প্রাণ। যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র যজ্ঞ-সূত্র। যজ্ঞোপবীতের অর্থ হলো—যজ্ঞের নিকটে উপস্থিত হওয়া। পরোপকারময় জীবন হেতু দীক্ষিত হওয়া, আমাদের জীবনযজ্ঞের জন্য। যজ্ঞোপবীত এই উদাত্ত আদর্শের দ্বিতীয় মহান প্রতীক। যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূতা—ঋষি ঋণ, পিতৃমাতৃ ঋণ ও দেবঋণ, এই তিন ঋণকে স্মরণ করাইয়া দেয়, জীবনযাত্রার পথে প্রত্যেক অবস্থানে আমাদের এই সূত্র আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়—তোমার জীবন অপরের জন্য। বাঁচিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। প্রতিটি মনুষ্য অপরের জন্যই। "আমি কি সমস্ত পৃথিবীর ভার লইয়াছি," এই বলিয়া তুমি কোন সেবা কার্য হইতে পৃথক্ থাকিতে পার না। হ্যাঁ—ব্রাহ্মণরূপে জগতের অজ্ঞান দূরীভূত করায়, ক্ষত্রিয় রূপে অন্যায় দূরীভূত করার, এবং বৈশ্যরূপে পৃথিবীর সর্বস্থানের অভাব পূরণ করার দায়িত্ব তুমি লইয়াছ।

এই আদর্শ বৈদিক সংস্কৃতিরই প্রাণ, মূল তত্ত্ব। বিশ্ব শান্তির এই রাজ পথ। পরিতাপের বিষয় এই যে, শিখা-সূত্র ধারণ করা আজকাল একটা প্রথামাত্র হইয়া অবশিষ্ট আছে এবং এই জন্য তার উপেক্ষাও হইতেছে। ভগবান্ আমাদের শক্তি ও ভক্তি প্রদান করুন; যাহাতে আমরা স্বীয় আচরণ দ্বারা বৈদিক সংস্কৃতিরই মহান প্রতীক "শিখা ও সূত্রের" মহত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হই।

ঈশ্বরী প্রসাদ 'প্রেম' এম. এ.

মথুরা (উঃ প্রঃ)

ওঁ৩ম্

"শিখা-সূত্র"— শিখার মহত্ত্ব

লর্ড মেকালে দ্বারা প্রচলিত বর্তমান ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও ঋষি সন্তান আজ নিজেদের মস্তকে শিখা রাখিতে লজ্জা অনুভব করে এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করা তাহার নিকট একটা ভার বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোকে বিভ্রান্ত নব যুবক তাদের ধার্মিক চিহ্নগুলি একে-একে ত্যাগ করিতে চলিয়াছে এবং—

বাবুভ্যো ধর্ম হীনেভ্যঃ স্থিতা মূত্র বিসর্জিভ্যঃ।
ভীতং সূত্র গতং ভূলৌ, শিখা ভীতং দিবং গতঃ।।

অর্থাৎ ধর্মহীনও দাঁড়াইয়া মূত্র বিসর্জনকারী বাবুদের ভয়ে সূত্র (যজ্ঞোপবীত) পাতালে, এবং শিখা আকাশে পৌঁছিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যে শিখা রক্ষার জন্য মহারানা প্রতাপ ও বীর শিবাজী সব কিছু উৎসর্গ করিলেন, এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের সন্তানগণ আত্মাহুতি দিলেন, সেই শিখা আধুনিক বাবুদিগের দ্বারা কর্তিত হইতেছে, তাহারা নিজ হস্তে স্বীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞানে প্রভাবিত নবযুবক জিজ্ঞাসা করে, **"আমরা শিখা কেন রাখিব?"** আমরা এখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইহার সমাধান উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব।

বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির মূলাধার। ধর্ম জিজ্ঞাসুদের পক্ষে **'শ্রুতিই'** পরম প্রমাণ। অতএব, আমাদের প্রথমে দেখা উচিৎ যে, বেদ এই সম্বন্ধে কি বলিতেছে। বেদে শিখা রাখিবার স্পষ্ট আদেশ আছে। দেখুন—

যত্র বানাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখাঃ ইব। যজু. ১৭/৪৮ এই মন্ত্রে 'বিশিখা' পদ আসিয়াছে, যাহার অর্থ হইল **'বিশিষ্টা, দীর্ঘা, গোক্ষুর পরিমাণ শিখা চূড়া তাদৃশাঃ কুমারা ইব,'** অর্থাৎ দীর্ঘ এবং গোক্ষুর পরিমাণ শিখা যুক্ত কুমারদের মত।

মহর্ষি দয়ানন্দ ইহার অর্থ করিয়াছেন—**"শিখাহীন বা বহু শিখাযুক্ত"** এইভাবে এই মন্ত্রে শিখার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এখন আর একটা মন্ত্র দেখুন—

আয়ুন্নপস্থে ন বৃকস্য
লোম মুখে শ্মশ্রূনি ন ব্যাঘ্র
লোম, কেশা ন শীর্ষন্যশসে শ্রিয়
শিখা সিংহস্য লোমত্বিষিরিন্দ্রিয়ানি।।

— যজু. ১৯/৯২

এখানে কীর্তি ও লক্ষ্মী প্রাপ্তিহেতু শিখা ধারণের বিধান দেওয়া হইয়াছে, এবং শিখার কেশের সহিত ব্যাঘ্রের অর্থাৎ সিংহের লোমের সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে।

শিখিভ্যঃ স্বাহা। অথর্ব ১৯/২২/১৫ অর্থাৎ শিখাধারীদের কল্যাণ হউক। এখন অন্য শাস্ত্রকারদের মত ও দেখুন—

সদোপবীতিনা ভাব্যংসদা
বধ্য শিখেন চ।
বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ য়ং করোতী ন তৎকৃতম্।।

কাত্যায়ন স্মৃতি সদা যজ্ঞোপবীতধারী ও শিখা বদ্ধ থাকা উচিৎ, শিখাহীন ও যজ্ঞোপবীত রহিত ব্যক্তি সে কাজ করে, তাহা অকৃত্য জানিবে, অতএব শিখা কেবল আর্য জাতির ধার্মিক চিহ্নই নহে; বরঞ্চ কর্তব্য কর্মের সহায়ক ও। মহর্ষি দয়ানন্দ ইহাকে আবশ্যক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

যজ্ঞোপবীত ও শিখা ত্যাগ করিয়া মুসলমান, খৃষ্টান দিগের ন্যায় হওয়া বৃথা।

(সত্যার্থ প্রকাশ ১১ সমু.)

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌গণ ও শিখা সম্বন্ধে অন্বেষণ করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাহারা সময়ে-সময়ে ভীষণ ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাদের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন; তাহাদের সম্মতি এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

স্যার চার্লস পার্লি ল্যুকস, ফিলাডেলফিয়া (আমেরিকা)—"শিখার সহিত শরীরের সেই প্রয়োজনীয় অংগের অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, যার দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধি এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চালন হয়। যখন থেকে আমি শিখার

বৈজ্ঞানিক মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি, তখন হইতে আমি স্বয়ংশিখা রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

—(সরস্বতী পত্রিকা ইং ১৯১৪ সং ৭)

ডা. হ্যমন—"আমি কয়েক বৎসর ভারতে থাকিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন করিয়াছি। এখানকার অধিবাসীগণ বহুকাল হইতে মস্তকে শিখা ধারণ করে, যার উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে অর্ধ শিরোপরি গোক্ষুর পরিমাণ শিখা রাখে। আমি তাহাদের বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য দেখিয়া অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছি। বৌদ্ধিক উন্নতিতে শিখা অবশ্যই অত্যন্ত সাহায্য করে। শিরোপরি শিখা ধারণ করা লাভপ্রদ। ইউরোপে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে লোকেরা মস্তকে দীর্ঘকেশ ধারণ করে না। হিন্দুধর্মে আমি গভীর বিশ্বাস রাখি। আমি নিজেও শিখা রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।"

—(গার্ড ম্যাগাজিন সংখ্যা ২৫৮, পৃ. ১২৩ ১৮৯৯ খ্রীঃ)

Dr. I. E. Clark-MSD (ডা. আই. ই. ক্লার্ক, এম. এস. ডি.) — "আমি যখন চীন দেশ ভ্রমণ করিতে গেলাম, তখন চীনাবাসীদেরও ভারতীয়দের মত অর্দ্ধ শিরোপরি শিখা ধারণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তখন হইতে আমি এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াই, আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, আর্যদের প্রত্যেক নিয়ম বা কর্ম বিজ্ঞান সম্মত, এবং শিখা ধারণ করা আর্যদের ধর্মমাত্র নহে, সুষুম্না কেন্দ্র রক্ষা-হেতু ঋষিমুনিদের অদ্ভূত আবিষ্কারও বটে"।

মি. আর্ল থামসেন—"সুষুম্না রক্ষাহেতু আর্যগণ শিখাধারণ এবং ইউরোপের অধিবাসীগণ দীর্ঘ কেশ ধারণ করেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই উভয়ের মধ্যে শিখা ধারণ করাকে আমি উপযুক্ত মনে করি, কেননা ইহা শরীরের ঠিক সেই স্থানের রক্ষা করে, মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে যার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি।" (অ্যালার্ম ম্যাগাজিন ১৯২১ খ্রীঃ সংখ্যা—৭১, পৃ. ১৯৬)

শাস্ত্রীয় প্রমাণের পরে এখন বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ অনুসারে শিখা ধারণে উপকারিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইল।

অন্তরেণ তালুকে য় এষ স্তন
ইর অবলম্বেত স ইন্দ্রয়োনিঃ।
অত্র অসৌ কেশান্তো বির্বততে
ব্যপোহ্য শীর্ষ কপালে।। (তৈত্তিরীয় উপনি. শিক্ষাবলী ৬/২)

মানুষের মুখ গহ্বরে তালুমধ্যে যে স্তনাকার মাংসপিণ্ড নির্গত রহিয়াছে, উহার পরে কেশের মূলস্থল ব্রহ্মরন্ধ্র। সেখানে মস্তিষ্কের দুই কপোল ভেদ করিয়া সুষুম্না নাড়ি বাহির হইয়াছে, যাহা ইন্দ্রযোনি অর্থাৎ পরমাত্মার প্রাপ্তিদ্বার। বৈদ্যগণ ব্রহ্মরন্ধ্রকে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নার মূল স্থলকে মস্তুলিঙ্গ বলেন। সমস্ত শরীরে শির অর্থাৎ মস্তকই মুখ্য অঙ্গ। এই শিরো মধ্যে দুই প্রবল শক্তির নিবাস, জ্ঞান-শক্তি ও কর্ম-শক্তি। এই দুই অংশের মূলস্থল মস্তিষ্ক ও মস্তুলিঙ্গ। মস্তিষ্ক জ্ঞানশক্তির ভাণ্ডার, এবং মস্তুলিঙ্গ কর্মশক্তির আলয়। মস্তিষ্কের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক সম্বন্ধ, এবং মস্তুলিঙ্গের সহিত কর্মেন্দ্রিয় সকলের— হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ ও বাক্ সম্বন্ধ। মস্তিষ্ক ও মস্তুলিঙ্গ যত সামর্থবান্ হইবে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সকল ততই বল ও শক্তি সম্পন্ন হইবে। মস্তিষ্কের জন্য শৈত্য ও মস্তুলিঙ্গের জন্য উষ্ণতা প্রয়োজন। মস্তিষ্ককে শীতল রাখিবার জন্য ক্ষৌর কর্ম করা এবং মস্তুলিঙ্গকে উষ্ণ রাখিবার জন্য তদুপরি গোক্ষুর পরিমাণ শিখা থাকা আবশ্যক। মস্তুলিঙ্গের জন্য উষ্ণতা প্রয়োজন। কিন্তু ইহা ন্যূনাধিক হইলে চলিবে না—মধ্যম প্রকার আবশ্যক। ইহা হ্যাট বা বস্ত্রাদি দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু শিখা দ্বারা সম্ভব। সে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার যথার্থ সহায়ক। যথা—কুম্ভ মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত হয়, তার প্রত্যেক অংশের পূর্তি ও মৃত্তিকা দ্বারা হইবে। মস্তুলিঙ্গ শরীরের অংশ বিশেষ হওয়াতে তার রক্ষা ও শিরোৎপন্ন পদার্থ কেশ দ্বারাই সম্ভব, কিন্তু হ্যাট বা টুপি দ্বারা নহে। অতএব, শিখা ধারণ করা বিধেয়।

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, **হ্যাট অপেক্ষা শিখার কি এমন বৈশিষ্ট্য?** বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে হ্যাট অপেক্ষা শিখার অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণে ইহা ভালরূপে বোধগম্য হইবে। পশমের সহিত সকলেই পরিচিত। পশম কি? ইহা মেষের দেহের লোম, যেমন—

আমাদের মাথায় আছে। অতএব ইহাদের উভয়ের মধ্যে গুণের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। পশমের বৈশিষ্ট্য জানিয়া লওয়ার পর শিখার বৈশিষ্ট্য জানিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না।

১) পশমের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল শীতাদি হইতে রক্ষা করা। ভয়ংকর শীত হইতে পশুদের রক্ষা তাদের ঘন লোমের দ্বারাই হয়।

২) শীতের মত বাহিরের তাপ হইতে ও পশম শরীরকে রক্ষা করে। তাপ হইতে বরফকে বাঁচাইবার জন্য কম্বল দিয়া ইহাকে আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে বাহিরের তাপ ইহার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে না। এবং উহা যেমন তেমনই থাকে।

৩) পশম বিদ্যুতের প্রবাহকে বাহির হইতে ভিতরে ও ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে দেয় না। কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইলে তাহাকে পশমের কম্বলের সাহায্যে ছাড়াইতে হয়।

দেহ হইতে ভিন্ন লোমে যখন এতগুলি গুণ বিদ্যমান। তখন দেহস্থিত লোমে এই সব গুণগুলি নিশ্চিতরূপে থাকিবেই। অতএব শিখা দ্বারা মর্মস্থানের যথাযথ রক্ষা হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মস্তিষ্কের উচ্চ ও উদ্‌গত অংশ মধ্যে শিখা ধারণ করা হয়। যাহাকে শীর্ষ বলে। শারীর বিজ্ঞান মতে শরীরের যে স্থলে শিখা ধারণ করা হয়, তথায় একটি মর্মস্থান আছে। যাহাকে 'পিনিয়ল গ্ল্যান্ড' নামে অভিহিত করা হয়। ইহার নিম্নে একটি বিশেষ ধরণের গ্রন্থি আছে। যাহাকে 'পিটুইটারি' বলে। এই গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। যাহা শিরাগুলির মাধ্যমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শরীরকে হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলবান্ করে। শিখার দ্বারা এইসব গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হয়, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। ইহাকে মনুষ্য কেবল স্বাস্থ্যবান্ থাকিয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয় না, বরঞ্চ তাহার জীবনীশক্তি ও অক্ষুণ্ণ থাকে।

সুশ্রুত মতে যেথায় শিখা ধারণ করা হয়, উহা অত্যন্ত কোমল স্থান এবং শিখার দীর্ঘকেশ উহাকে রক্ষা করে। শরীরে ১০৭টি মর্মস্থান আছে। ইহার মধ্যে ছয়টি স্থল এমন যে উহাতে আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের মৃত্যু ঘটে। এই জন্য সুশ্রুতে বলা হইয়াছে—

মস্তকাভ্যান্তরত উপরিষ্ঠাৎ
শিরসন্ধি সন্নিপাতো।
রোমা বর্তোঽধিপ পতিঃ
তত্রাপি সদ্য এব মরণম্।।

সুশ্রুত—৬/২০

মস্তিষ্কের মধ্যে ঊর্দ্ধাদিকে যেখানে কেশাবর্ত সেখানে শিরা ও সন্ধির সংযোগ হইয়াছে। উহা অধিপ নামক মর্মস্থল। তথায় আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। আমাদের মহর্ষিগণ উক্ত মর্মস্থলের রক্ষা হেতু শিখা ধারণের বিধান নির্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে গোক্ষুর পরিমাণ শিখা ধারণ করিলে শীতকালে শীত হইতে, গ্রীষ্মকালে ভয়ংকর তাপ হইতে এবং বর্ষাকালে জলধারা প্রযুক্ত আঘাত হইতে রক্ষা হইতে পারে।

মানব শরীরের সহিত একটি দূর্গের উপমা দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই শরীররূপী দূর্গের পাঁচটি প্রান্ত। রোম, চর্ম, রুধির, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রর এই সাতটি গর্ভগৃহ। সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, সূর্য, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রধার এই অষ্টচক্র যেন আটটি প্রাসাদ। অষ্টম প্রাসাদে সম্রাটরূপী জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মের নিবাস, যথা দূর্গের রাজভবনে বিশেষ মহত্ত্ব হেতু তদুপরি পতাকা শোভায়মান হয়, তদ্রুপ শরীর-রূপী দূর্গে ব্রহ্মরন্ধ্রে, যথা ব্রহ্মের বাসস্থান, তথায় শিখা ধারণ করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। কোন স্থানের বৈশিষ্ট জ্ঞাপন হেতু তথায় পতাকা প্রোথিত করিয়া দেওয়া হয়, তদ্রুপ উক্ত পবিত্রস্থলের জ্ঞাপন হেতু মাথায় শিখা অত্যন্ত উপযুক্ত পতাকা সন্দেহ নাই। মস্তিষ্ক একটি বিশাল সমুদ্র এবং শিখা দিকনির্ণয় যন্ত্র সদৃশ। কোন জলযানের ক্যাপ্টেনের নিকট দিকনির্ণয় যন্ত্র না থাকে, তবে সে জলযান সমুদ্রে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে, সঠিক পথের নির্দেশ পাইবে না। এই প্রকার যে ব্যক্তি শিখারূপ দিকনির্ণয় যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহার তরণী এই সংসার সমুদ্রে বৃথা পরিক্রমা করিতে থাকিবে, তাহার ব্রহ্ম দর্শন হওয়া অসম্ভব। এই শিখা ব্রহ্মরন্ধ্রের নির্দেশ দেয়, এই জন্য আমাদের আচার্যগণ তথায় শিখা ধারণ

করাইয়া সন্ধ্যার সময় গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা শিখা বন্ধন করার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যাহাতে চিত্তবৃত্তিকে ব্রহ্মধ্যানের দিকে কেন্দ্রিত করা যাইতে পারে।

গীতার মতে—"**উর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্।**" (গীতা—১৫/১) অর্থাৎ আমাদের শরীর একটি বৃক্ষ। বৃক্ষমূল আমাদের শির অর্থাৎ মস্তক। শিখার কেশগুলি ইহার শিকড়। স্কন্ধ হইতে কটি প্রদেশ প্রদেশ পর্যন্ত অংশগুলি ইহার শাখা। বিভিন্ন প্রকার বিষয় ইহার পত্র। সুকর্ম ও কুকর্ম ইহার পুষ্প এবং সুখ-দুঃখ ইহার ফল। কোন বৃক্ষের মূল কোন সময় ছিন্ন করা হয় না, কারণ তাহাতে বৃক্ষ শুকাইয়া যায়, অতএব শরীররূপী বৃক্ষের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য শিখা ধারণ আবশ্যক।

মস্তিষ্কের কেন্দ্র অর্থাৎ শিখার স্থান বৃক্ষের "**টেপরুট**" এর সমান, এবং শিখার কেশগুলি টেপরুটের লোমগুলির সমান। টেপরুটের লোমগুলি যেমন পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করে। তদ্রুপ শিখার কেশগুলি বায়ু হইতে অক্সিজেন (Oxygen) আকর্ষণ করে। টেপরুপের উপরের লোমগুলির মত মানুষের লোমও ভিতরে ফাঁকা। টেপরুপের উপরের লোমগুলি ছুলিয়া ফেলিলে বৃক্ষ রস আকর্ষণ করিতে পারে না, সেই মত শিখার কেশগুলি কাটিয়া ফেলিলে মস্তিষ্ক প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব শিখা ধারণ করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য। তাই তিনি মুসলমান বা খ্রীষ্টানই হোন না কেন। যে ব্যক্তি শিরোপরি শিখারূপ কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন, তিনি স্বীয় শিরোপরি প্রাণবায়ু আকর্ষণকারী "পাম্প" ধারণ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির (Nature) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি অর্জন করিতে সক্ষম। জটিল সমাধান করতে পারেন এবং যোগাভ্যাস করার উপযুক্ত।

বনের পশুগণ কদাপি বস্ত্র ধারণ করে না, তথাপি তারা রুগ্ন হয় না। বরঞ্চ হৃষ্টপুষ্ট থাকে। ইহার কারণ স্পষ্ট, ইহাদের শরীরের লোমগুলি উন্মুক্ত থাকে, এবং উহারা ঠিক মত প্রাণবায়ু শোষণ করিতে পারে।

দীর্ঘ জটাগুলি পৃথিবীর শক্তিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, যে ব্যক্তি শিরোপরি এত দীর্ঘ জটা ধারণ করেন যে, উপবেশন অবস্থায় তাহা ভূমি স্পর্শ করে; তাহা হইলে তাহার ওই জটাগুলি বিশেষ আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন হয়। ইহার কারণ এই যে, ইহাতে মস্তিষ্কের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক হয়, এবং

পৃথিবীর শক্তি লম্বিত কেশ দ্বারা মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়। ইহাতে বিশেষ প্রকার আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। পাঠক বলিবেন যে, ইহার পিছনে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নাই। অতএব আমরা ইহা মানিতে বাধ্য নই। ইহার প্রমাণ দেখুন— আমরা সন্ধ্যা করিবার সময় প্রতিদিন মার্জন মন্ত্র পাঠ করিয়া বলি, "ওম্ ভূঃপুনাতু শিরসি"। অর্থাৎ পৃথিবী আমাদের মস্তিষ্ক পবিত্র করুন। অতএব ইহা স্পষ্ট হইল যে, আমরা শিখা দ্বারা পৃথিবীর সর্বপ্রকার শক্তি স্বীয় শরীরে আকর্ষণ করি।

আমেরিকার চিকিৎসকদিগের মতে দীর্ঘ শ্মশ্রু, দীর্ঘ গুম্ফ এবং শিরোপরি দীর্ঘ কেশ বীর্য সংরক্ষণ সহায়ক। দীর্ঘ শিখা বীর্যরক্ষার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। প্রাচীন কালের ব্রহ্মচারীগণ ও বাণপ্রস্থীগণ এই জন্য জটাধারী হইতেন।

ভারতীয় আচার্যগণ ও মুনিঋষিদিগের মতানুসারে ও শিখা হইতে বুদ্ধি, শক্তি, আয়ু ও তেজঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন কথিত হইয়াছে—

দীর্ঘায়ুণ্ট্বায় বলায়, বর্চসে শিখায়ে বষ্‌ট অর্থাৎ দীর্ঘায়ু, শক্তি ও তেজঃ হেতু শিখাকে স্পর্শ করি, প্রশ্ন হইতেছে যে, শক্তি, আয়ু ও তেজঃ বৃদ্ধির সহিত শিখার কি সম্পর্ক? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমাদিগকে মানব শরীর গঠন বুঝিতে হইবে।

মানব শরীর গঠনের প্রতি মনোযোগ দিলে জানা যাইবে যে, শারীরিক প্রবৃত্তি সকলের কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্ক মানসিক ও শারীরিক সর্ব প্রকার ক্রিয়াগুলির সঞ্চালন ইহার দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিখার স্থানই কাম-স্নায়ুগুলির কেন্দ্র। যদি ওই স্থানে উত্তেজনা উৎপন্ন করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইবে। যদি আমাদের মস্তিষ্ক সুস্থ ও সবল থাকে তাহা হইলে মনুষ্য সুস্থ থাকিয়া "**জীবেম শরদ ঃ শতম্**", বেদের এই আজ্ঞা মত শতবর্ষ কেন, তদ্‌অপেক্ষা ও অধিককাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। মস্তিষ্ককে সুস্থ, সবল ও শক্তিশালী করিবার জন্য শিখা ধারণ একটি অব্যর্থ উপায়।

শিখার সহিত বল, বীর্য, স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীর সম্পর্ক। এই বিষয়ে "হরি বংশ" পুরাণে একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সগর নামে মহর্ষি বশিষ্ঠের এক বিশ্ব বিজয়ী ক্ষত্রিয় শিষ্য ছিল, পাশ্চাত্য-দেশীয় কতিপয় রাজন্যবর্গ মিলিয়া

তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। সগর পিতৃদেবের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, তাহারা ভয়ার্ত হইয়া বশিষ্ঠ মুনির শরণাপন্ন হইল, এবং প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিল। মহর্ষি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে, উহাদের বিজেতা তাহার শিষ্য স্বয়ং, তখন উভয় পক্ষের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হেতু ঋষি বশিষ্ঠ আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, উহাদিগকে প্রাণে বধ না করিয়া উহাদের সকলের শিখা কর্তন করিয়া দেওয়া হউক। যাহাতে উহারা শক্তিহীন ও মৃতবৎ হইয়া পড়িবে। শিষ্য সেই মত করিলে এবং লোকেরা এই দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, সেই সব রাজাগণ নির্জীব তুল্য ও প্রভাবশূন্য হইয়া গেল।

খ্রীষ্টানদের মধ্যেও অনুরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সাম্‌সন অ্যাগোনিষ্টিসের (Somson Agonistes) প্রতাপে অন্য রাজাগণ সদা কম্পমান। তাঁহাকে মারিবার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহার সমস্ত শক্তি তাহার শিরোপরি শিখায় নিহিত। তাহারা ছলের আশ্রয় লইয়া ঘুমন্ত অবস্থায় 'সামসনের' শিখা কাটিয়া লইল। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখিলেন যে, তাহার শিখা কর্তন করা হইয়াছে এবং তাহার সমস্ত শক্তিলুপ্ত হইয়াছে। ফলস্বরূপ তিনি শত্রুদিগের হস্তে পরাজিত হইলেন।

শিখা দ্বারা কেবল ব্রহ্মচর্য রক্ষা, বল, আয়ু ও তেজঃ প্রাপ্ত হয় না, বরঞ্চ গোক্ষুর পরিমাণ শিখা ধারণ করিলে ব্রহ্মশক্তির ও আকর্ষণ হয়। পাশ্চাত্যে জগতের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিক্‌টর ঈ. ক্রোমর (Victor E. Cromer) সাহেব লিখিয়াছেন—

In meditation on receives the Virillic influse. While concentrating one however concentrates ones mind upon God, there is an outgoing and inflowing process setup. The concentration of mind upon words sends a rush of his force though the top of the head and the response comes as a fine rain of soft magnetism. These two force cause a beautiful display of colour to the higher vision. The outpouring from above is beautiful beyond description" (Vril Kalpaka)

অর্থাৎ "ধ্যানের সময় ওজঃশক্তির আবির্ভাব ঘটে। কোনবস্তুর প্রতি চিন্তনশক্তি একাগ্র করিলে ওজঃশক্তি তৎপ্রতি ধাবিত হয়, যদি পরমাত্মার প্রতি চিত্ত একাগ্র করা হয়, তাহা হইলে মস্তকোপরি শিখা-পথে ওজঃশক্তি আবির্ভূত হয়। পরমাত্মার শক্তি সেই পথ দিয়া মনুষ্যের মধ্যে আসিতে থাকে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন যোগী পুরুষগণ এই উভয়শক্তির চমৎকার বর্ণেরও দর্শন করেন। যে শক্তি পরমাত্মার দিক দিয়া আমাদের মধ্যে আসে তাহার বর্ণন করা সম্ভব নহে।

এইভাবে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে শিখা দ্বারা ঊর্ধ্বদিক দিয়া শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাই আয়ু, তেজঃ ইত্যাদির বৃদ্ধির কারণ। পরম হংস সন্ন্যাসী সর্বদা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত থাকে। অতএব তাহাদিগকে শিখার সাহায্যে শক্তি আকর্ষণ করার প্রয়োজন নেই।

মুখ, বক্ষ ইত্যাদি স্থলে কেশোদ্‌গম হইলে পৌরুষশক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নারী শক্তির বৃদ্ধি কেশোদ্‌গম দ্বারা না হইয়া মাসিক ধর্ম্ম, ধর্ম, স্তনে দুগ্ধ ও জরায়ু বৃদ্ধি দ্বারা হয়। যৌন বৃদ্ধির সহিত কেশোদ্‌গমের সম্বন্ধ থাকিলে যেমন বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া নূতন শাখা প্রবল বেগে উদ্ভূত হয়, তদ্রুপ প্রতিদিন কেশ ছেদন করিলে যৌন বেগ ভিতরের কাম শক্তি রূপে স্নায়ু মধ্যে আবির্ভূত হয়। যাহার ফলে বীর্য স্খলিত হইয়া মনুষ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। এইজন্য ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থীদের জন্য বিশেষরূপে কেশ ধারণ করার বিধি বর্ণিত হইয়াছে। কেশাধিক্য হেতু কাম সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলি শান্ত থাকে এবং বীর্য নিঃসরণ হওয়ার উত্তেজনা প্রাপ্ত হয় না। শিখা ধারণ করার জন্য আর্যগণ শক্তি, আয়ু, তেজ, ব্রহ্মচর্য, মেধা, আত্মচিন্তন ও সংযমে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে শিখাহীন ব্যক্তিগম উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও বিলাসিতা আদি দুর্গুণ গ্রস্ত। শিখার প্রতি আস্থা লোপ হওয়াতে আর্যদিগের মধ্যেও উপরোক্ত গুণগুলি হ্রাস পাইতেছে এবং দুর্গুণগুলি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সন্ধ্যা করিবার সময় গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা শিখা বন্ধন করা হয়, সেই সময় অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আকর্ষিত হইয়া মনুষ্য মধ্যে স্থিতিলাভ করে, তারা মস্তিষ্ক কেন্দ্র হইতে প্রস্থান না করে এবং আমরা স্বীয় সাধনার লাভ হইতে বঞ্চিত না হই, তদর্থে শিখা বন্ধন করা হয়। শিখায় সর্বদা গ্রন্থি লাগাইয়া রাখিলে মানসিক শক্তির অপব্যয়ের বহুলাংশ রক্ষিত হয়। সাইকেলের চাকায় ভর্তি বায়ুরোধ

হেতু একটি ছোটো 'ভাল্ব টিউব' নামক রবার নালিকা থাকে, যার দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বাইরে আসিতে পারে না। শিখার গ্রন্থি দ্বারা এই প্রয়োজন সাধিত হয়। উহা বাহিরের বিচার ও শক্তি গ্রহণ করে সত্য, কিন্তু ভিতরের তত্ত্বগুলির অপব্যয় হইতে দেয় না, শিখার নিম্নে বুদ্ধির স্থান, শিখা বন্ধন দ্বারা বুদ্ধিকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে উহা পরমাত্মাতে মগ্ন থাকে। ঈশ্বর ভক্তিতে আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ আবশ্যক, অতএব ধরিয়া লওয়া হউক যে, ইহাতে আত্মা ও বুদ্ধির যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

পৃথিবীতে শীর্ষের মহত্ত্ব অত্যধিক, সবাই শীর্ষে উপনীত হইবার চেষ্টা করে, গুহা মধ্যে নহে। আমাদের শিরোপরি স্থিত শিখা সর্বদা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদিগকে শিখর পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে। এই শিখা আমাদিগকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছে যে, আমাদিগের জ্ঞান শীর্ষের হউক, বিজ্ঞান শীর্ষের হউক, ধনৈশ্বর্য শীর্ষের হউক, আমাদের শক্তি শীর্ষের হউক, আমাদের বিদ্যাশীর্ষের হউক, বুদ্ধি শীর্ষের হউক, আমাদিগকে মহত্তম উন্নতি করিতে হইবে। আমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম স্থিতি প্রাপ্ত করিতে হইবে—ইহা স্মরণ রাখিবার জন্যও শিখা ধারণ করা আবশ্যক।

পৃথিবীতে যতগুলি জাতি আছে তন্মধ্যে আর্য জাতিই শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে বেশি সক্ষম। আর্যগণ শীতকালে প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং সায়ংকালে স্নান করিতে ভীত হয় না। ইহার একমাত্র কারণ—শিখা। শিখা ত্যাগ করিলে মর্মস্থান দুর্বল হইয়া পড়ে। যাহাতে শীতোষ্ণ সহ্য হয় না।

গোক্ষুর পরিমাণ শিখা ধারণ করিলে বীর্যের উর্দ্ধগতি হয়। উর্দ্ধরেতাই জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের গৃহে যোগীদিগের জন্ম হয়। এই একমাত্র কারণ যে, ভারতবর্ষে পতঞ্জলি সদৃশ যোগাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শিখাচ্ছেদন করিলে বীর্য অধোগামী হয়, পুরুষত্ব নষ্ট হইলে নারীগণ বশীভূত না থাকিয়া ব্যভিচারে নিযুক্ত হয়, এবং তাহাতে নিষ্কর্মা ও অধার্মিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, শিখা ত্যাগ করিলে এতাদৃশ বহুক্ষতি হওয়া সম্ভব।

মুসলমান, খৃষ্টানাদি শিখা ধারণ করে না, তাহাদের কেন ক্ষতি হয় না? উহার উত্তর এই যে সূক্ষ্মরূপে ক্ষতি অবশ্যই হয়, কিন্তু ইহার উপলব্ধি না

হওয়াতে ঠিক বোধগম্য হয় না। মুসলমানও খৃষ্টানদিগের স্মরণশক্তি দাক্ষিণাত্য বিদ্বান্ দিগের অপেক্ষা অত্যন্ত ন্যূন। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ আর্যদিগের মত সংযমীত নয়। শিখা ইহার একমাত্র কারণ, কেন না যাহা বিদ্যমানে কিছু ঘটে এবং উহার অবর্তমানে তাহা ঘটে না, তবে উহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে জানিতে হইবে।

সন্ন্যাসীগণ শিখা ধারণ করেন না; তাহাদিগের কি ক্ষতি হয় না? না, হয় না। কেন না সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান পঞ্চ সপ্ততি (৭৫) বৎসর পর দেওয়া হইয়াছে। সেই সময় পর্যন্ত লঘু মস্তিষ্ক, সুষুন্না জ্ঞান কেন্দ্র পরিপক্ক হইয়া যায়, সেই সময় পর্যন্ত শিরোভাগের বিশেষ করিয়া শিখা স্থলের ত্বক শক্ত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া শিখা ঘটিত লাভ ও পঞ্চসপ্ততি বৎসর পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া যায়। সন্ন্যাসী শীতোষ্ণ সহ্য করিতে অভ্যস্ত, সুতরাং শিখা ধারণ না করিলে উহাদের কোন ক্ষতি হয় না।

শিখা ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি করার প্রথা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে এবং আর্য জাতি ব্যতিরেকে অন্য কোন মতাবলম্বী শিখা বিজ্ঞানের অনভিজ্ঞতাবশতঃ শিখাহীন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কোন সময়ে সর্বদেশে ও জাতি মধ্যে শিখা ধারণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টানদিগের ধর্মশাস্ত্র বাইবেলে সামসনের সম্বন্ধে একটি কাহিনী লক্ষিত হয়। তিনি খুব প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাহার শত্রুগণ তাহাকে পরাজিত করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া ও সফল হইল না, অবশেষে ফিলীস্তীনদিগের সরদার তাহার প্রেমিকাকে বলিল, "তুই ইহার শক্তির রহস্য অবগত হইয়া আমাদিগকে জানাইবি, প্রতিদানে আমরা তোকে প্রচুর সম্পত্তি প্রদান করিব"। সেই রমণী জিজ্ঞাসা করায় সামসন বলিলেন যে, তাহার শিরোপরি কেশ তাহার শক্তির হেতু, যদি তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি নির্বল হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মত হইয়া পড়িবেন। তখন—

And she made him sleep on her knees and she called for a man, and she caused him to shave off the seven locks of his head and she began to afflict him and his strength went from

him. (Judges–16-19)।

সেই রমণী তাহাকে তাহার কোলে শোয়াইয়া দিল এবং একজন লোককে আহ্বান করিয়া তাহার শিরোপরি মাথাটির কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করাইয়া দিল, সে তাহাকে যাতনা দিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার শক্তি তাহাকে ত্যাগ করিল।

প্রাচীনকালে কয়েক প্রকার শিখা রাখিবার বিধানও ছিল। মহর্ষি দয়ানন্দ "সংস্কার বিধি"-তে লিখিয়াছেন—(চূড়াকর্ম) পাঁচটি এবং অল্প অল্প কেশ রাখিতে হইবে, এই প্রথা বিকৃত হইয়া খৃষ্টানদিগের মধ্যে সাতটি কেশগুচ্ছ হইয়া থাকিবে। ইহাতে খৃষ্টানদিগের মধ্যে শিখা ধারণ করা প্রত্যক্ষ হইল।

ডা. আই. ই. ক্লার্কের পূর্বপ্রদত্ত উদ্ধৃতি দ্বারা চীনে ও শিখাধারণ করার প্রথা সম্বন্ধে জানা যায়।

হিব্রু জাতির মান্যগ্রন্থ "তল্মঙ"-এ এ সম্বন্ধিত কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা ওই জাতির মধ্যেও শিখা ধারণ করার প্রথা ও প্রচলিত ছিল— জানা যায়।

মুসলমানদিগের তুর্কি টুপির উপরে কালো সূতার গুচ্ছ শিখা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইউরোপিয়ান সৈন্যগণের শিরোস্ত্রাণের উপর পিতলের শিখা থাকে। রাজা ও সেনাপতিদিগের শিরোপরি পক্ষীর পালক-শিখা ছাড়া আর কিছু না। ময়ূরের শিখি ও কুক্কুটের তাম্রচূড় নাম সর্ববিহিত। রাজসর্পের মস্তকেও শিখার কথা শ্রুত হয়।

এইভাবে ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সর্বপ্রকার দিক দিয়া মানব জীবনে শিখার অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ স্থান। অতএব প্রত্যেক আর্যই নয়, বরঞ্চ প্রত্যেক মনুষ্যকে, ধর্ম, মত সম্প্রদায় নির্বিশেষে শক্তি, আয়ু, তেজ ও বুদ্ধি বৃদ্ধি হেতু আজ হইতেই শিখাধারণ করা উচিৎ।

"যজ্ঞোপবীতের মহত্ত্ব"

বৈদিক ধর্মে ষোড়শ সংস্কার সুবিদিত, প্রত্যেকটি সংস্কার যদিও মহত্ত্বপূর্ণ, তথাপি উপনয়ন সংস্কারের মহত্ত্ব অন্যান্য সংস্কারগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি। উপনয়নের পূর্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একজ থাকে, উপনয়ন দ্বারা

তাহারা "দ্বিজ" হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহাদের প্রথম জন্ম—মাতা-পিতা হইতে হয়, এবং দ্বিতীয় জন্ম আচার্য হইতে হয়। যতক্ষণ এই সংস্কার না হয় ততক্ষণ—

ন যস্মিন্যুঞ্জতে কর্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জী
বন্ধনাৎ।। মনু. ২/৭১

যজ্ঞোপবীত সংস্কার ব্যতীত দ্বিজ কোন শুভ কর্মকাণ্ডের অধিকারী নয়। মনুদেবের কথামত যজ্ঞোপবীত রহিত বালকের বৈদিক কর্মকাণ্ড ও হবন যজ্ঞ করার কোন অধিকার নাই, এবং তাহাকে দ্বিজ শ্রেণিমধ্যে গণনা করা হয় না। উপনয়ন হইলেই বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞের অর্থ কেবল "**ওম্ অগ্নয়ে স্বাহা, ওম্ সোমায় স্বাহা**" বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা মাত্র নয়। যজ্ঞের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।

"**যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমম্ কর্ম**"।

যজ্ঞের অর্থ—শ্রেষ্ঠতম কর্ম। যজ্ঞ শব্দ "**যজ্ঞ দেবপূজা সঙ্গতিকরণ দানেষু**" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। অতএব যজ্ঞের অর্থ হইল ঈশ্বর-উপাসনা, বিদ্বান্‌দিগের সংসর্গ এবং দান। যজ্ঞোপবীত একটি অধিকার পত্র। যেমন কোন বিদ্যার্থী গাউন না পরিলে, তাহাকে ডিগ্রী দেওয়া হয় না। কোন উকিল গাউন ধারণ না করিলে তাহাকে ওকালতি করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। তদ্রুপ যতক্ষণ পর্যন্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয় না; ততক্ষণ কোন বালক সন্ধ্যা-উপাসনা, অগ্নিহোত্র, মাতা-পিতা, আচার্যদিগের সেবা-শুশ্রুষা, অতিথি সৎকার, বলিবৈশ্য দবের যজ্ঞ এবং দান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না। অতএব, যজ্ঞোপবীত ধারণ না করার অর্থ নিজেকে সেই সব অধিকার সকল হইতে বঞ্চিত রাখা। প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তিকে এতদ্ সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহান্বিত হওয়া উচিৎ।

কিন্তু বর্তমান সভ্যবর্গদিগের দ্বারা এই মহত্ত্বপূর্ণ সংস্কারের যাদৃশ অবহেলা ও দুর্দশা হইতেছে, তাহা লিখিতে লেখনি স্তব্ধ, মস্তক ঘূর্ণিত, এবং অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। ঔরঙ্গজেবের দীপ্ত তরবারী যে যজ্ঞোপবীত আমাদের স্কন্দ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সম্প্রতি লর্ড মেকালের শিষ্যগণ উহা তুচ্ছ বলিয়া নিক্ষেপ করিতেছে। যে যজ্ঞোপবীত আর্য শরীরের শোভাবৃদ্ধির কারণ বলিয়া

মনে করা হইত। আজ যজ্ঞোপবীত মনুষ্যের উন্নতির পক্ষে বাঁধাস্বরূপ বলা হইতেছে। আজ যখন অন্যান্য মতাবলম্বীগণ স্বীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জাতীয় চিহ্নগুলি অনুসন্ধান করিয়া পুনঃ ধারণ করিতেছে, তখন আমরা, যাঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন তন্মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তিগণ কোন বিশেষ লৌকিক লাভ হেতু ইহা পরিধান করেন। তাহা তাহাদের কর্তব্য ও নিয়মের প্রতি কখনো মনোযোগ প্রদান করেন না। তাহাদের পক্ষে যজ্ঞোপবীত একগুচ্ছ সূত্র মাত্র। যাহা সিন্দুকে চাবি বাধিয়া রাখিবার কাজে ব্যবহৃত হয় জাতীয় কবি স্বর্গীয় মৈথিলীশরণ গুপ্ত মর্মান্তিক ভাষায় লিখিয়াছেন—

যজ্ঞোপবীত দেখ উন্‌কা, ধন্যভাগ সরাহিয়ে।
পর চাবিয়োঁ কে বাঁধনে কো ডোর ভী তো চাহিয়ে।।

অর্থাৎ ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, তিনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, ইহার প্রশংসা করা উচিৎ। কিন্তু ইহা তো তিনি চাবিগুলি বাঁধিয়া রাখিবার সূত্রের প্রয়োজনে ধারণ করিয়াছেন।

সূত্র (যজ্ঞোপবীত)

পাঠকগণ! এই যজ্ঞোপবীত চাবিগুচ্ছ ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য নহে। ইহা তো একটি মহত্ত্বপূর্ণ পবিত্র ও বৈজ্ঞানিক .... যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার সময় অথবা যজ্ঞোপবীত পরিধান করিবার সময় যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়, তন্মধ্যে ইহার মহিমা স্পষ্ট নিহিত আছে। মন্ত্রটি হইল—

য়জ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্য়ৎ
সহজং পুরস্তাদ্।
আয়ূষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং য়জ্ঞোপবীতং
বলমস্তু তেজঃ ।। ১ ।।
য়জ্ঞোপবীতমসি য়জ্ঞস্য ত্বা য়জ্ঞোপবীতে—
নোপনহ্যামি ।। ২ (পারস্কর গৃ. সূ. ২/২/১১)

অর্থাৎ এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র এবং প্রজাপতির সহিত ইহার উদ্‌ভব হইয়াছে। এই শ্বেতবর্ণের যজ্ঞোপবীত আয়ু প্রদানকারী। ইহাকে তুমি ধারণ করো। ইহা তোমাকে শক্তি ও তেজঃ প্রদান করুক। ১ ।।

তুমি যজ্ঞোপবীত তোমাকে যজ্ঞ কর্ম হেতু ধারণ করি এবং যজ্ঞোপবীত দ্বারা নিজেকে বন্ধন করি। ২।।

"য়জ্ঞোপবীতং পরমম্" এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীতকে আয়ু, শক্তি ও তেজ প্রদাতা বলা হইয়াছে। ইহা সত্য যে এই **"ত্রিসূত্র"** মধ্যে শক্তি ও তেজ লক্ষিত হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত অর্থবোধক ব্রহ্মচর্য আদি নিয়ম পালন করিবে এবং অষ্টপ্রকার মৈথুন পরিহার করিয়া বৈদিক নিয়মগুলি অনুসরণ করিবে। তাহার বল, শক্তি, তেজ, মেধা ও স্মরণশক্তির অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব, যজ্ঞোপবীত এই সমস্ত গুণ দান করে।

যেমন চতুর্বিংশ সহস্র মাইল বেষ্টন করিয়া বিস্তৃত ক্ষেত্রের পরিজ্ঞান চিত্র অথবা গ্লোব দ্বারা করান হইয়া থাকে। তদ্রূপ এই যজ্ঞোপবীত ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটি সারগর্ভ ক্ষুদ্র মানচিত্র যজ্ঞোপবীতে যে বিজ্ঞান নিহিত আছে, আমরা এখানে তদ্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

যজ্ঞোপবীত কি? যজ্ঞোপবীত শব্দ **"য়জ্ঞ ও উপবীত"** এই দুই শব্দ মিলিয়া হয়, যাহার অর্থ যজ্ঞ প্রদানকারী হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

য়জ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। (শত. ১/১/১/২)

যজ্ঞ দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে বলা হইয়াছে। এই জন্য যজ্ঞোপবীতের অর্থ "পরমাত্মা প্রদাতা"। উপনয়ন ও সংস্কারের দ্বিতীয় সমানার্থক শব্দ। যাহার অর্থ এমন সংস্কার যার মাধ্যমে বালককে গুরু সমীপে লইয়া যাওয়া হয়। যেহেতু এই সূত্র দ্বিজাতীর নিকট ব্রহ্ম তত্ত্ব ও বেদ জ্ঞানের সূচনা প্রদান করে। এই জন্য ইহাকে 'ব্রহ্ম-সূত্র'ও বলা হয়। এই প্রকার ইহাকে 'যজ্ঞ-সূত্র', সাবিত্রী-সূত্র, পৈতা, পরিবীত এবং বাসও বলা হয়।

উপনয়ন সংস্কার হেতু ঋষিগণ ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন ঋতু নির্ধারণ করিয়াছেন এবং এই ঋতু ক্রম সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সম্মত।

বসন্তে ব্রাহ্মণং, গ্রীষ্মে রাজন্যং, শরদি বৈশ্যম্। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত বসন্ত ঋতুতে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্ম ঋতুতে, এবং বৈশ্যের শরৎ ঋতুতে হওয়া উচিৎ। শতপথ ব্রাহ্মণ মতে এই ঋতুগুলি ও ক্রমশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ব্রাহ্মণ স্বভাবে শান্ত এবং বসন্ত ঋতুও তদ্রুপ। বসন্ত ঋতুতে পৌষ ও মাঘ মাসের

ভয়াবহ শীত, এবং জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের অসহ্য উষ্ণতার লোপ থাকে। অতএব ব্রাহ্মণবালকের জন্য এই ঋতুই উপযুক্ত। গ্রীষ্মঋতু উষ্ণতা প্রধান এবং ক্ষত্রিয় বালকের মধ্যেও সেই তেজ ও পরাক্রম স্বাভাবিক রূপে থাকে। অতঃ ক্ষত্রিয় বালকের উপনয়ন গ্রীষ্ম ঋতুতেই হওয়া উচিৎ। ব্যবসায়-কর্ম শরৎ ঋতুতে আরম্ভ হয়। ধনধান্যে পরিপূর্ণ শরৎ ঋতুতে বৈশ্য প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। শরৎকালের পোষণ শক্তি ও বৈশ্য প্রকৃতির অনুকূল। অতএব এই সব গুণগুলির উন্নতি সাধন হেতু বৈশ্য বালকের উপনয়ন শরৎ ঋতুতেই হওয়া বিধেয়।

উপনয়ন কোন বয়সে হইবে ইহার জন্য বিভিন্ন বর্গের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ আছে। যথা—

অষ্টবর্ষ ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ গর্ভাষ্টমং বা
একাদশ বর্ষ রাজন্যঃ, দ্বাদশ বর্ষ বৈশ্যম্।

(পারস্কর গৃ. ২/২/১-৩)

ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন অষ্টম বর্ষে অথবা গর্ভ হইতে অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে হওয়া উচিৎ। যদি কোন বিশেষ কারণবশতঃ উক্ত সময়ে এই কার্য সম্পাদিত হইতে না পারে। তাহা হইলে ইহার দ্বিগুণ বয়স অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বালকের ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ, এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশ বর্ষের আয়ু পর্যন্ত হইতে পারে। যেমন মনুদেব বলিয়াছেন—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতি বর্ততে
আদ্বাবিংশৎক্ষত্র বন্ধোরা চতুর্বিংশতের্বিশঃ।

মনু. ২/৩

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ হইতে অধিক ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ হইতে অধিক এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশ বর্ষ হইতে অধিক আয়ুতে যজ্ঞোপবীত সংস্কার হওয়া উচিৎ নহে। ইহার পরে যদি তাহাদিগের সংস্কার না হয়, তবে তাহারা পতিত হইয়া যায়, এবং 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

এই কাল বিভাগ ও অত্যন্ত যৌক্তিক এবং তর্কসম্মত। বৈদিক সাহিত্যে

৩৩ (তেত্রিশ)টি দেবতা বিদ্যমান; অর্থাৎ **অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি**। দেবতাদিগের মধ্যে **'বসু'** ব্রাহ্মণ স্বরূপ, **'রুদ্র'** ক্ষত্রিয়স্বরূপ, এবং আদিত্য বৈশ্য স্বরূপ, ব্রাহ্মণদের রাজ্যে এই সব অষ্ট বসুদিগের সহিত মিলিত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করেন। অতএব, অষ্টম বর্ষেই ব্রাহ্মণ বালকের যজ্ঞোপবীত হওয়া উচিৎ। রুদ্রের সংখ্যা একাদশ। ক্ষত্রিয়ের মত ইহারও রজোগুণ প্রধান। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের সংস্কার হেতু এই উপযুক্ত সময়। আদিত্যের সংখ্যা দ্বাদশ। বৈশ্যের মত ইহারা স্বীয় সঞ্চিত সামগ্রী দ্বারা বিশ্বকে পালন করিয়া থাকে। সকল ধনধান্যে ইহাদেরই অনুগ্রহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু বৈশ্যদিগের জন্য দ্বাদশ বর্ষে এই সংস্কার হওয়া উত্তম।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রকার ছন্দ হইতে সৃষ্টির বিস্তৃতি নির্ণয় করিবার সময় লিখিয়াছেন—

গায়ত্রা ছন্দসা ব্রাহ্ম নম সৃজৎ।
ত্রিষ্টুভা, রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যম্।।

গায়ত্রী ছন্দ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, ত্রিষ্টুপ হইতে ক্ষত্রিয়, এবং জগতী ছন্দ হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। গায়ত্রী হইতে ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় বার জন্ম হয়, এরূপ বলা হইয়া থাকে। গায়ত্রী ছন্দের এক একটি পাদ ৮ (আট)টি অক্ষরের হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ বালকের জন্য অষ্টম বর্ষ ছাড়া অন্য কোন সময় বেশি উপযুক্ত হইতে পারে ও আটের দ্বিগুণ ষোল, অর্থাৎ উপনয়নের শেষ অবধি ষোড়শ বর্ষ। ত্রিষ্টুপের প্রত্যেকটি পাদে এগারটি করিয়া অক্ষর হয়। অতএব ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে উপনয়ন হওয়া উচিৎ। এগারোর দ্বিগুণ বাইশ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন হওয়ার শেষ অবধি দ্বাবিংশ বর্ষ। জগতী ছন্দ হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। জগতী ছন্দের প্রত্যেকটি পাদে বারোটি করিয়া অক্ষর থাকে। সুতরাং বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত দ্বাদশ বর্ষেই হওয়া উচিৎ। বারোর দ্বিগুণ চব্বিশ। অতএব বৈশ্যের উপনয়নের শেষ অবধি চতুর্বিংশ বর্ষ।

এই আলোচনার পর আমরা যজ্ঞোপবীতের নির্মাণ বিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যজ্ঞোপবীত হস্তের চারি অঙ্গুলির চারিদিকে ছিয়ানব্বই বার আবর্তন করানো হয়। এই প্রকার যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ ছিয়ানব্বই বিঘৎ হয়। এইরূপ

হওয়ার জন্য নিম্ন কারণ দ্রষ্টব্য :—

চতুর্বেদেষু গায়ত্রী চতুর্বিংশতিকাক্ষরী।
তস্মাচ্চতুর্গুণং কৃত্বা ব্রহ্ম তন্তু মুদীরয়েৎ।। (শিষ্ঠ স্মৃতি)

অর্থাৎ চতুর্বেদে গায়ত্রী চব্বিশটি অক্ষরের হয়। এই জন্য ব্রহ্মসূত্র ও ২৪ × ৪ = ৯৬ বিঘৎ হয়। যজ্ঞোপবীত দ্বারা বালক গায়ত্রী ও বেদ উভয়ের অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব এই সংখ্যা লক্ষ্য রাখিয়া ছিয়ানব্বই অঞ্জলি (বিঘৎ) যজ্ঞোপবীত পরিধান করিবার বিধান আছে।

ছান্দোগ্য পরিশিষ্ঠে এই প্রশ্নের সমাধান করিবার সময় বলা হইয়াছে—

তিথি বারং চ নক্ষত্রং তত্ত্ব বেদ গুণান্বিতম্।
কাল ত্রয়ং চ মাশাশ্চ ব্রহ্ম সূত্রম্ হিষন্নবম্।।

অর্থাৎ ১৫ তিথি, ৭ বার, ২৭ নক্ষত্র, ২৫ তত্ত্ব, ৪ বেদ, ৬ গুণকাল ও ১২ মাস এই সব মিলিয়া মোট সংখ্যা ৯৬ (ছিয়ানব্বই) হয়। যজ্ঞোপবীতে এই সমস্ত অন্তর্নিহিত আছে। অতএব যজ্ঞোপবীত ৯৬ বিঘৎ পরিমাণের হয়।

মানব মান ৮৪ অঙ্গুলির, এবং দেবমান ৯৬ অঙ্গুলির হয়। যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্বক বেদব্রত ও ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দেবত্ব ও অবশেষে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হউক। এই জন্য যজ্ঞোপবীত দেবমান অর্থাৎ ৯৬ অঙ্গুলির যজ্ঞোপবীত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, এই যজ্ঞোপবীত স্কন্দ হইতে কটি প্রদেশ পর্যন্ত সীমিত নহে, বরঞ্চ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রতিটি রোম ইহা দ্বারা আবদ্ধ।

যজ্ঞোপবীতে তিনটি সূত্র আছে। মাত্র তিনটি কেন? ইহারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। আমাদের মধ্যে 'তিন' সংখ্যাটির অত্যন্ত মহত্ত্ব আছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক— তিন। গার্হপত্য, আহবণীয়, দক্ষিণাগ্নি—তিন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—যজ্ঞের অধিকারী ও তিন। অতএব যজ্ঞোপবীতে তিন সূত্র হওয়া সুসঙ্গত।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ। এই তিন আশ্রমে থাকিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয়। চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসে প্রবেশ করিলেই ইহা নামাইয়া দেওয়া হয়। যেহেতু ইহা তিন আশ্রমে ধারণ করা হয়, অতএব এই অভিপ্রায়েও ইহাতে তিনটি সূত্র।

যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র—প্রকৃতির তিনটি গুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমের

প্রতীক। বাল্যাবস্থায় তমোগুণ প্রধান থাকে। বালক অন্ধকার রূপ অজ্ঞানে নিমগ্ন থাকে। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় গুরু সম্পর্কে আসিলে এই অজ্ঞান দূরীভূত হয়, ব্রহ্মচর্য অবস্থার পর মনুষ্য গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে, ইহাতে রজো গুণ প্রধান থাকে। শাস্ত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্ম করিতে থাকিয়া রজোগুণ হইতে পৃথক্ থাকা গৃহস্থের মুখ্য ধর্ম। পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া বাণপ্রস্থ অবস্থায় সত্ত্ব গুণ ও ত্যাগ করা উচিৎ এবং সন্ন্যাস অবস্থায় ত্রিগুণাতীত হইয়া যাওয়া উচিৎ।

এই তিনটি সূত্র মনুষ্যকে ত্রিগুণাতীত হওয়ার দিব্য প্রেরণা দান করে। যখন মনুষ্য ত্রিগুণাতীত হইয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে যজ্ঞোপবীতের কোন প্রয়োজন থাকে না।

যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র—পরমাত্মা, আত্মা ও প্রকৃতি। এই তিন অস্তিত্বের সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত করায় ও সঙ্কেত প্রদান করে। পরমাত্মা কি? তাহার স্বরূপ কী? তাহার প্রাপ্তি কিভাবে হইতে পারে, ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হইবার জন্য যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিগণ সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ—আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? আমাকে কোথায় যাইতে হইবে? আমার জীবনের লক্ষ্য কী? ইত্যাদি আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধান ও যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি কী? ইহাকে কিভাবে কাজে লাগাইয়া জীবনে সুখী হওয়া যাইতে পারে? ইত্যাদি প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাপ্ত করার চেষ্টা তিনি করিয়া থাকেন। যে যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তি আমাকে পরমাত্মা, আত্মা ও প্রকৃতির রহস্য অর্থাৎ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। তাহাদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা সার্থক। যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র—সদ্‌বিচার, সদ্‌বাণী ও সদ্ আচারের দিকেও নির্দেশ করে।

যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র—মনুষ্যের দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃ-মাতৃঋণ—তিনটি ঋণের প্রতি ও সংকেত করে। যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র স্মরণ করাইয়া দেয় যে, কেহই স্বতন্ত্র নহে। সবাই তিনটি ঋণে আবদ্ধ, এবং সবাইকে উহা পরিশোধ করিতে হইবে। ইহা তো সুন্দর, উদাত্ত ও মহান্ শিক্ষা। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ইহা অনুভব করিত যে, আমাদের এই তিনটি ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তাহা হইলে মনুষ্যদিগের মধ্যে স্বার্থ নামক কোন জিনিসই থাকিত না। সমস্ত দেশ স্বর্গের মত হইয়া যাইত। কোন ব্যক্তি অসুখী বা অশিক্ষিত থাকিত

না। সমগ্র পৃথিবী দেশভক্তি ও প্রভুভক্তির লহরে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত।

যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, বিদ্যাধ্যয়ণ ও অধ্যয়ণ দ্বারা ঋষিঋণ এবং মাতৃ-পিতৃ সেবা ও সুপ্রজা নির্মাণ দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ হয়।

যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র ব্রহ্মগ্রন্থি দ্বারা একে অপরের সহিত সম্বদ্ধ থাকে। ইহার অর্থ হইল এই যে, মনুষ্য—জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা এই তিন তত্ত্বকে এক সঙ্গে প্রাপ্ত হোক।

প্রতিটি সূত্রে তিনটি করিয়া তার থাকে, এই তারগুলি সাধারণ তার নহে, বরঞ্চ বিভিন্ন দেবতাগণের বাসস্থান। এই নয়টি দেবতা কী? এই সম্বন্ধে গৃহ্য সংগ্রহে বলা হইয়াছে—

ওম্‌কার প্রথম স্তন্তুর্দ্বিতীয়শ্চাগ্নি দেবতঃ।
তৃতীয়ো নাগদেবত্যশ্চতুর্থঃ সোম দেবতঃ।
পঞ্চম পিতৃ দেবভ্যঃ ষষ্ঠশ্চৈব প্রজাপতি।
সপ্তমো বায়ুদৈবত্যশ্চাষ্ট মো য়মঃ
দেবতঃ।
নবম সর্বদেবভ্যঃ ইত্যেতে নব
তন্তুবঃ। গৃ. ২/৪৯-৫১

যজ্ঞোপবীতধারী বালককে যজ্ঞোপবীতে স্থির এই নয়টি দেবতার নিম্ন গুণগুলি দ্বারা নিজেকে অলংকৃত করা উচিৎ।

১. ওম্‌কার—ব্রহ্মজ্ঞান।
২. অগ্নি—তেজস্বিতা, উন্নতি কামনা।
৩. অনন্ত— ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা।
৪. চন্দ্রমা—সৌম্যভাব, আহ্লাদিত ভাব, শীতল ও মাধুর্য।
৫. পিতৃগণ—স্নেহশীলতা, সংরক্ষণ, কুলধর্ম ধারণ ও আশীর্বাদ।
৬. প্রজাপতি—প্রজাপালন, স্নেহ ও সৌহার্দ্র।
৭. বায়ু—গতিশীলতা, পবিত্রতা, বলশালীতা।
৮. সূর্য—প্রকাশ ধারণ, অন্ধকার দূরীকরণ।
৯. সর্বদেবতা—সমস্ত দিব্যগুণ ও সাত্বিক জীবন।

যে ব্যক্তি দেবতাদিগের এই গুণগুলি প্রতিদিন মনন করিয়া স্বীয় জীবনে

ধারণ করিতে সচেষ্ট হইবেন, তাহার জীবন নিঃসন্দেহে শুদ্ধ, পবিত্র, উচ্চ ও মহান্ হইবে। নয়টি তারের অন্য একটি রহস্য আছে। আমাদের শরীরে নয়টি দ্বার আছে। যথা—দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, নাসিকার দুইটি ছিদ্র, একটি মুখ, এবং দুইটি মল-মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য দ্বার, এই সব দ্বারগুলি দিয়া অপবিত্র বিচার, আমাদের মধ্যে আসে, এবং ইহাদের দ্বারাই আমাদের শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে। যেমন বলা হইয়াছে—

ইন্দ্রীদ্বার ঝরোখা নানা, তঁহ তঁহ সুর বৈঠে
করথানা।
আওয়াত দেখহিঁ বিষয় বিয়ারী। তেহঠি
দেশিঁ কপাট উঘারী।।

যজ্ঞোপবীতের এই নয়টি তার আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, আমাদের প্রত্যেক দ্বারে এক একটি প্রহরী আছে, যাহাতে আমাদের মনে কুবিচার আসিতে না পারে।

যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত হইলে তাহাতে প্রণবরূপী মহামন্ত্র গায়ত্রীর উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মগ্রন্থী দেওয়া হয়। ব্রহ্মসূচক হওয়াতে ইহাকে "ব্রহ্মগ্রন্থী" বলা হয়। পৃথিবীতে এমন একটি রীতি প্রচলিত আছে যে, যখন আমরা কোন বিশেষ বস্তু স্মরণ করিতে ইচ্ছা করি, তখন বস্ত্রে গ্রন্থি অর্থাৎ গীট (গাঁঠ) লাগাইয়া দিই। ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ উদ্দেশ্যের স্মারক হওয়াতে ইহাকে "ব্রহ্মগ্রন্থি" বলা হয়। 'প্রণব' অর্থাৎ 'ওম্' জপ দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তির শাস্ত্রীয় পদ্ধতি কত উত্তম নির্দেশ।

ব্রহ্মগ্রন্থির উপরে যজ্ঞোপবীতে আরো পাঁচটি গ্রন্থি দেওয়া হয়। এই পাঁচটি গ্রন্থি—ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিযজ্ঞ ও বলিবৈশ্যদেব যজ্ঞ করার আদেশ প্রদান করে। পূর্বোক্ত তিনটি ঋণ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এইসব যজ্ঞগুলি করা অতি আবশ্যক ও অনিবার্য।

যজ্ঞোপবীত বামস্কন্ধ হইতে নিম্নদিকে হৃদয় ও বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়া কটি প্রদেশ পর্যন্ত পতিত হয়। ইহার মধ্যে ও একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত আছে। কথিত হয় যে, শরীরের ভিতরে পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধ হইয়া বক্ষের মধ্য দিয়া

কোমর পর্যন্ত একটি প্রাকৃতিক রেখা আছে। ইহার আকৃতি ধনুসদৃশ। উক্তরেখা বিদ্যুতের ন্যায় ইন্দ্রিয় সকলে উষ্ণতা উৎপন্ন করিয়া মনুষ্য মধ্যে কাম, ক্রোধাদি সৃষ্টি করে। এই রেখার প্রভাব লজ্জাবতী গুল্মের মত। ইহা স্পর্শ মাত্র মূর্ছিত হয়। যজ্ঞোপবীত উক্ত রেখা উপরিস্থিত হয় বলিয়া যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত হীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় কামুক, ক্রোধী ও হিংস্র হয় না।

যজ্ঞোপবীত এমন প্রকারে ধারণ করিবার মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তিনটি ঋণভার আছে। ভার স্কন্ধ দ্বারা বহন করা হয়, এই জন্য যজ্ঞোপবীত স্কন্ধ উপরি ধারণ করা হয়। কটিবদ্ধ ব্যক্তিই ভার বহনে সক্ষম। এই জন্য যজ্ঞোপবীত কটি প্রদেশে আন্দোলিত হয়। এই সংসারে তিনিই সফল মনস্কাম হইতে পারেন। যিনি স্বীয় সমক্ষে উদ্দেশ্য স্থাপন করেন, এবং লক্ষ্য তাহারই সমক্ষে স্থির থাকিবে। যিনি কোন কর্ম হৃদয় সহযোগে করেন। অতএব যজ্ঞোপবীত হৃদয়ের উপর স্থিত হয়।

যজ্ঞোপবীতের সম্বন্ধে আরো দুই একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথম—এক সময় এক ব্যক্তি মাত্র একটি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে, দুইটি নহে। দ্বিতীয়—যজ্ঞোপবীত হলুদ রং বা কেশর আদি দ্বারা রঞ্জিত করা উচিৎ নহে। কেন না মন্ত্রে 'ওম্ শুভ্রম্' বলা হইয়াছে।

মেখলা

উপনয়নে মেখলাও ধারণ করা হয়। মেখলা হইতে প্রাণ ও অপান বল প্রাপ্ত হয়। ফলস্বরূপ হার্নিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে ব্রহ্মচারীর বল বৃদ্ধি পায় এবং কোমরের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। আজকাল নব যুবকদের কোমর শীঘ্র অবনমিত হইয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ 'মেখলা' ধারণ না করা। ইংরেজগণ যে বেল্ট (Belt) ধারণ করেন, উহা মেখলার প্রতিরূপ। কিন্তু মেখলার বৈশিষ্ট্য বেল্ট বা কটিবন্ধে কি করিয়া ঘটিত হইতে পারে?

নারীদিগের যজ্ঞোপবীত অধিকার। ধর্মের কয়েকজন ঠিকাদার নারীদিগকে এই মহত্বপূর্ণ সংস্কার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চায়। কিন্তু প্রাচীন কালে নারীদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকার ছিল। এই বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দের সম্মতি এইরূপ—

প্রাচীনকালে নারীদিগের প্রথমে বিদ্যা অর্জনের অধিকার ছিল এবং তদনুকূল তাহাদের ব্রতবন্ধ পূর্বেই সম্পাদিত হইত।

(ব্যাখ্যান মঞ্জরী সপ্তম ব্যাখ্যান)

প্রাচীনকালে নারীগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিত। এই সম্বন্ধে অনেক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যাইতে পারে। যথা—

প্রাবৃতাং য়জ্ঞোপবীত নী মভ্যদা নয়জ্জয়েৎ (গো. ২/১/১৯)

তখন বর যজ্ঞোপবীত পরিহিত ও বস্ত্রচ্ছাদিত বধূকে আনিয়া বলিবে—

মহাকবি বাণ কাদম্বরীর প্রমুখ পাত্র মহাশ্বেতাকে যজ্ঞোপবীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেখুন—

চূড়ামণি চন্দ্রময়ূখ জালেনেব মণ্ডলী
কৃতেন ব্রহ্মসূত্রেন পবিত্রী কৃতকায়ামি।।

(কাদম্বরী নির্ণয়, প্রেস পৃষ্ঠ ২৪৮২/৩-৪)

বেদে নারীদিগের জন্য যজ্ঞোপবীতের স্পষ্ট বিধান আছে—

ভীমা জায়া ব্রহ্মণস্যোপনীতা। ঋ.১০/১০৯/৪

যজ্ঞোপবীত পরিহিত ব্রাহ্মণজায়া অত্যন্ত শক্তিশালিনী হয়। এইরূপ বেদাদি শাস্ত্রমতে নারীদিগের যজ্ঞোপবীত পরিধান করার অধিকার আছে; এবং তাহাদিগের যজ্ঞোপবীত অবশ্য ধারণ করা উচিৎ।

যজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রী

যজ্ঞোপবীতের সময় গায়ত্রীমন্ত্রের ও উপদেশ দেওয়া হয়। প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এইরূপ কেন? ইহার এতখানি মহত্ত্ব কেন? ইহার উপর সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। উপনয়ন সংস্কারের পরে বেদারম্ভ সংস্কারে বেদ হইতে আরম্ভ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সেই সময় বিদ্যার্থীর বেদাঙ্গ সম্বন্ধে অধিগম্য না থাকাতে বেদার্থ গ্রহণে সক্ষম হয় না। অতএব বেদের সার রূপ গায়ত্রীর উপদেশ করা হয়।

গায়ত্রীর ঋষি **"গাথিনো বিশ্বামিত্রঃ"**। গাথিনের অর্থ হইল গুরুকুলে থাকিয়া বেদ অধ্যয়ণকারী এবং বিশ্বামিত্রের অর্থ সকলে সকলের মিত্র, সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ ব্যবহারকারী। ব্রহ্মচারীকে বেদ-অধ্যয়ণ করিতে এবং প্রাণীমাত্র প্রতি

প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যহেতু তাহাকে গায়ত্রীমন্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

যজ্ঞোপবীতের সার্বভৌমিকত্ব

কোন সময়ে যজ্ঞোপবীত সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। সে বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হইল—ইউনানে যজ্ঞোপবীত কেনেট (Kennet) সাহেব স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন, রোমনগণ প্রাস্টেস্টা (Prastestta) নামক যজ্ঞোপবীত ধারণ করিত এবং যদবধি তাহাদের যজ্ঞোপবীত হইত না, তাহাদিগকে ধার্মিক সভা অথবা রাজ্য সভায় বসিতে দেওয়া হইত না।

পারসীদিগের মধ্যে যজ্ঞোপবীত পারসীদিগের মধ্যে নবজাত সংস্কারে বালক ও বালিকাদিগকে 'কুশ্‌তী' নামক সূত্র পরাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে প্রো. ওয়াডিয়া লিখিয়াছেন—

It corresponds to the Hindu Upanayan. It marks the initiation of a boy or girl into the religion and therefore the ceremony is called the Navjote which literally means new birth. (Zoroaster by Prof. A. R. Wadia. P-40)।

অর্থাৎ ইহা হিন্দুদিগের উপনয়ন সংস্কারের অনুরূপ। ইহার দ্বারা বালক-বালিকার ধর্ম প্রবেশ চিহ্নিত হয়, সুতরাং এই সংস্কারকে 'নবজোত' বলা হয়, যার আক্ষরিক অর্থ নবজন্ম।

'খৃষ্টানদিগের মধ্যে যজ্ঞোপবীত'।

রোমন ক্যাথলিকগণ যজ্ঞোপবীতের মত পশমের এক প্রকার বিশিষ্টসূত্র সর্বদা কমরে বাঁধিয়া রাখে। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ইহারও তিনটি গ্রন্থি হয়। প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান পাদ্রীদেরও ধার্মিক অনুষ্ঠানে কোমরে দড়ি বাঁধা হয়।

মুসলমানদিগের মধ্যে যজ্ঞোপবীত।

মুসলমানদিগের মধ্যে সূত্ররূপ যজ্ঞোপবীতের মত মালার প্রচলন আছে। হজ যাত্রা করিবার সময় প্রত্যেক হাজীকে স্বীয় কণ্ঠে শ্বেত বস্ত্র খণ্ড ধারণ করিতে হয়। উহাও যজ্ঞোপবীতের প্রতীক।

শিখদের মধ্যে যজ্ঞোপবীত।

শিখদের মধ্যে যজ্ঞোপবীতের প্রচলন ছিল। শিখ গুরুদিগের শাস্ত্রীয় বিধিমত যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইত। এখানে স্থান সংকীর্ণবশতঃ মাত্র দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে—

অসবিধি শ্রীনানক গতি দানী।
উপদেশন কী উচরত বাণী।।
বদন বদন বিপ্রন বরি আঈ।
যজ্ঞোপবীত দিয়ো পহরাঈ। (নানক প্রকাশ, পৃ. ৪২)

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ—

"পন্থ প্রকাশ" পুস্তকে জ্ঞানীসিংহ, গোবিন্দ সিংহের বিবাহকালে তাহার শরীর সৌন্দর্য বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

পীত পুনীত উপরনা ধোতী
জোতি নবি ছবি ছাজৈ।
পীত জনেউ মনোবদন
সসি পৈ বিজরী বিজরী ভ্রাজৈ। [পন্থ প্রকাশ, পৃ. ৫১০)]

(এখানে জনেউ শব্দটির অর্থ যজ্ঞোপবীত—অনুবাদক)

জৈনদিগের মধ্যে যজ্ঞোপবীত।

জৈন তীর্থংকরগণ ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন, এই সম্বন্ধে ঋষভদেবের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল—

কণ্ঠহারে লতাং বিভ্রন কটিসূত্র কটাতটে।
ব্রহ্ম সূত্রোপবীতাঙ্গম্ সংগাংগোপ্প
মিবাদ্রি রাট ।। [আদি পুরাণ, পৃ. ৪৮০]

এখানে ঋষভদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহার কণ্ঠে দিব্যহার শোভা পাইতে ছিল, কটিতে কটিবন্ধ এবং বক্ষঃস্থলে পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীত ছিল। এই জন্য ঋষভদেব পর্বতোপরি গঙ্গাধারাবৎ শোভা পাইতেছিল।

দুঃখের বিষয় যে, এত পবিত্র ও সর্ব প্রচলিত যজ্ঞোপবীত পরিধান করিবার ধারণা লোকদের মন থেকে অপসারিত হইতেছে। যীশুখৃষ্টের ফাঁসির চিহ্ন 'নেকটাই' সাদরে বাবুদিগের কণ্ঠলগ্ন হইতেছে, চামড়ার হ্যাট তাহাদের মস্তকে গৌরবের সহিত ধারণ হইতেছে। এমন কি দারোগা, পুলিশ, চাপরাশী,

যজ্ঞোপবীতের মত চামড়ার বেল্ট ধারণ করিতে গৌরব অনুভব করে, কিন্তু যজ্ঞোপবীত উহাদের নিকট ভার বলিয়া বোধ হয়। এই সব ব্যক্তিগণকে ভর্ৎসনা করিয়া মহর্ষি দয়ানন্দ ঠিকই বলিয়াছেন—

যখন প্যান্ট আদি বস্ত্রধারণ কর এবং বেল্ট আদির কামনা কর, তখন যজ্ঞোপবীত কি বেশী ভারী হইয়া গিয়াছে?

(সত্যার্থ প্রকাশ. একা. সমু.)

ঋষি সন্তানগণ! ভারত মাতর প্রিয় পুত্রগণ। আর্য নব যুবকগণ। এখনও সচেতন হও। বিধিবৎ স্বীয় 'যজ্ঞোপবীত-সংস্কার'' করাইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হও। পাশ্চাত্য আড়ম্বর ও জাঁকজমক হইতে 'বেদের' দিকে প্রত্যাবর্তন কর।

ওম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গীত

তাল—একতালা। রাগিনী—ইমন্।

আজ দলিত হিন্দু উথলি সিন্ধু, উপবীত লহ আসিয়া।
ঘৃণ্য অধম শূদ্র নামের, কালিমাটা দাও মুছিয়া।।
বলশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত মোরা, মোদের বংশ ঋষি গোত্রে সেরা,
ঋষিপুত্র সব বঞ্চিত বেদে, মিছা শাস্ত্র কুহকে ভুলিয়া।
শোধিতে দেব, পিতৃ-মাতৃ ঋণ, এই যজ্ঞসূত্র জাগরণি চিন।
বিশ্বমানিবে শান্তি দানিবে, দিবে মিলন সূত্রে গাঁথিয়া।।
জন্মনা জায়তে শূদ্র, বেদ পাঠেৎ ভবেদ বিপ্র।
ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ হইবে, দ্বিজ সংস্কার লইয়া।।
সত্য শাস্ত্রে বৈদিক যুগে, ক্ষাত্র বৈশ্য শূদ্র সব।
বর্ণাশ্রম ধর্ম করিতে পালন, ষোড়শ সংস্কার হইয়া।।

।।ওঁম্।।

ওঁম্ ভূর্ভুব স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

শ্রী দেবেন দেববর্মণ

পরিব্রাজক **স্বামী শুদ্ধানন্দ জী** মহারাজের অনুপ্রেরণায় শ্রী দেবেন দেববর্মণ বৈদিক ধর্মের মুখ্য ধারায় পদার্পণ করে অর্জিত জ্ঞানের কিছু অংশ সমাজের সাধারণ মানুষের পারলৌকিক, কল্যাণকারী জ্ঞান বিতরণে সহযোগিতা করেছেন। সুতরাং শ্রী দেবেন দেববর্মণের সদবুদ্ধির পরিচায়ক হিসেবে **শিখা সূত্র** নামক বইটি লোক সমাজে উৎসর্গ করেছেন।

– বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা